ব্যবস্থাপনার পরিবেশ
Management Environment

ইউনিট ৩

পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝানো হয়। ব্যবস্থাপনাকে এ পারিপার্শ্বিক অবস্থারই এক অংশ হিসেবে, অন্যান্য অংশের সাথে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত উপাদান এবং বাহ্যিক পরিবেশগত উপাদানও রয়েছে। ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে সমাজের প্রতিও এর রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যবস্থাপনাকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর্ন্তজাতিক, আইনগত ইত্যাদি নানান দিক - বিবেচনা করতে হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : ব্যবস্থাপনা পরিবেশের সংজ্ঞা, ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ, বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান

পাঠ-৩.২ : ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব

পাঠ-৩.৩ : ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত, আন্তর্জাতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব

পাঠ-৩.৪ : ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব,ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা, ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে- বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

পাঠ-৩.১ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের সংজ্ঞা, ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ, বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান

Environment in Management, Different Factors of Masnagement Environment, Direct and Indirect Factors of Environment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ

Environment in Management

পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝানো হয়। এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ব্যবস্থাপনার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক অবশ্যই আছে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের প্রথম দিকে, ব্যবস্থাপনা চিন্তাবিদগণ ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র ঐসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতেন-যে সব বিষয়ের উপর ব্যবস্থাপকদের সরাসরি প্রভাব ছিল। এই বিষয়গুলো মূলত ব্যবস্থাপনার অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানসমূহ, যেমন- তদারকী পরিসর, ব্যবস্থাপনা স্তর, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি। কিন্তু তারা বাহ্যিক পরিবেশগত দিক যেমন, রাজনৈতিক অবস্থা অথবা জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনা এসবের উপর গুরুত্ব দিতেন না।

এটা অবশ্য একদিক দিয়ে খারাপ ছিল না। কারণ যখন সংগঠন একটা স্থির পারিপার্শিক অবস্থায় কাজ করে তখন ব্যবস্থাপককে বাহ্যিক পরিবেশের উপর সামান্য মনোযোগ দিলেই চলে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে- যার প্রভাব পরে ব্যবসায়। আর তার এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ। অর্থনীতির ওঠানামা, ক্রেতাদের মানসিকতার পরিবর্তন, সরকারী সংস্থাসমূহের নিয়ম নীতি, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল এবং শ্রমের বর্ধিত মূল্য- এ সবই সংগঠন এবং এর ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংগঠনকে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। যেমন, কাঁচামাল সরবরাহকারী কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি করলে উৎপাদিত পণ্যের খরচ বেড়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে পণ্য মূল্য বেড়ে গিয়ে ক্রেতাদের অসুবিধা সৃষ্টি করবে। ক্রেতাদের এই অসুবিধা দূর করার জন্য তাই ব্যবস্থাপককে প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

এক সময় ব্যবসায়ের মালিকদের কৌশল ছিল, ব্যবসায় যত বেশি সম্ভব মুনাফা বৃদ্ধি করা যায় ততই তাদের জন্য ভাল। কিন্তু এখন সংগঠনের প্রতিটি কাজেই চিন্তা করতে হয়- নির্দিষ্ট কাজের প্রভাব জীবনযাত্রায় কীভাবে পড়বে। ব্যবস্থাপকগণ শুধু মালিকদের কাছেই দায়ী থাকেন না। তারা দায়ী থাকেন সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে, যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হন। এখানে দু'ধরনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দল জড়িত থাকে। প্রথমত, প্রতিযোগী, প্রতিবাদী দল, সরকারী সংস্থা ইত্যাদি। যেমন, আপনি যদি অধিক মুনাফার জন্য শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেন, তাহলে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করবে। ফলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে আপনার মুনাফা কমে যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান

Different Factors of Masnagement Environment

পরিবেশের উপাদানসমূহকে দু'ভাবে চিহ্নিত করা যায়।প্রথমত, পরিবেশের যে সব উপাদান সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে- যা মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের আওতাভুক্ত। দ্বিতীয়ত, যে সব উপাদান পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। এ বিষয়গুলো মূলত বাহ্যিক পরিবেশের আওতাভুক্ত।

১. অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment)

প্রথমত, পরিবেশের যে সব উপাদান সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনারউপর সরাসরি প্রভাব ফেলে- যা মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের আওতাভুক্ত।

২. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment)

বাহ্যিক পরিবেশ বলতে সংগঠনের বাইরের ঐসব উপাদানকে বুঝায় যা সংগঠনের কাজের জন্য প্রাসঙ্গিক। সংগঠনগুলো কখনই স্বনির্ভর নয়। তাদেরকে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তারা পরিবেশ থেকে কাঁচামাল, অর্থ, শ্রম, সংগ্রহ করে করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য অথবা সেবার আকারে পুনরায় বাহ্যিক পরিবেশে সরবরাহ করে।

বাহ্যিক পরিবেশে সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উভয় প্রকার উপাদানই আছে। সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো হলো ভোক্তা, শ্রমিক, ইউনিয়ন, সরবরাহকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এগুলো সংগঠনের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে।

পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো হলো প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সমাজের রাজনীতি। পরোক্ষ উপাদানগুলো সংগঠন যে পরিস্থিতিতে কাজ করছে তাতে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীতে সরাসরি প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা অর্জন করে।নিচের চিত্রে সংগঠনের সাথে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন পক্ষসমূহের সম্পর্ক দেখানো হলো-

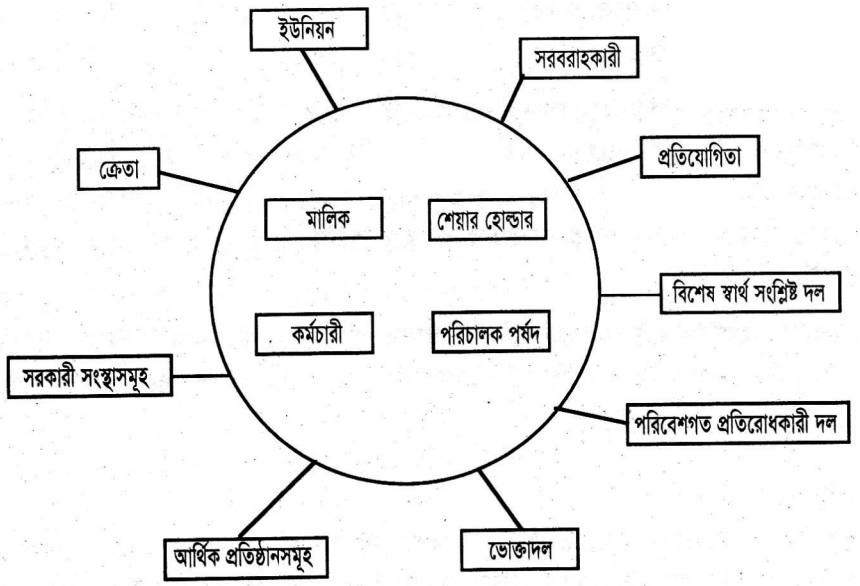

চিত্র : প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পক্ষসমূহ

সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ

Direct and Indirect Factors of Environment

সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ: মনে করুন আপনি একটি গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করতে চান। একটু চিন্তা করে দেখুন এক্ষেত্রে কি কি উপাদান আপনার শিল্পকে প্রভাবিত করতে পারে-

১। প্রথমেই আপনি চিন্তা করবেন আপনার শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শ্রমিক, প্রযুক্তি ইত্যাদি কোথায় এবং কীভাবে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এসবের সরবরাহকারী কারা। কাদের কাছ থেকে আপনি স্বল্প দামে দ্রুত সরবরাহ পেতে পাবেন। কারণ সঠিক সময় ও সঠিক মূল্যে মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত না হলে, আপনার উৎপাদন ব্যাহত হবে। যেমন, শীতের কাপড় বানানোর জন্য উলের সরবরাহ শীত শুরু হওয়ার পূর্বে নিশ্চিত না করলে, কাপড় উৎপাদন করে শীতের মধ্যে বাজারে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না।

২। আপনার শ্রমিক সরবরাহও নিশ্চিত করতে হবে। কীভাবে সহজ মূল্যে আপনি দক্ষ শ্রমিক পাবেন তার নিশ্চয়তা পেতে হবে। যেমন- পাটকলের শ্রমিক আদমজীতে যত সহজে পাবেন- গাজীপুরে ততটা সহজে পাবেন না।

৩। আপনার উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতাসাধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রেতারাই আপনার ব্যবসায়ের সাফল্য এনে দেবে। আপনাকে জানতে হবে- কারা আপনার ক্রেতা, তারা কি পছন্দ করে ইত্যাদি। সেভাবেই আপনার কাজের সম্প্রসারণ ণীতি গ্রহণ করতে হবে। ক্রেতাদের পছন্দমত দ্রব্যের মান, মূল্য, সেবা ইত্যাদি যথাযথভাবে বজায় রেখে, তাদের চাহিদা পূরণ করতে হবে। যেমন আপনার ক্রেতা যদি তরুণ শ্রেণীর হয়- তাহলে বুঝতে হবে তারা আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে সচেতন। কাজেই ফ্যাশন বদলের সাথে সাথে, আপনার উৎপাদিত পণ্যের মানও বদল করতে হবে। অন্যথায় বাজারে আপনার পণ্য বিক্রি হবে না।

৪। ব্যবসায় সব সময়ই প্রতিযোগীরা তৎপর থাকে। আপনি আপনার ব্যবসা বাণিজ্য এবং অধিক মুনাফার জন্য প্রতিযোগীদের চেয়ে ভাল পণ্য ও সেবা প্রদানের চেষ্টা করবেন। কাজেই আপনাকে অধিক ক্রেতা সন্তুষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রকট।

৫। অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানও আপনার ব্যবসার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে আপনি যখন আমদানি-রপ্তানী করবেন তখন - ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির সাহায্য আপনাকে নিতেই হবে। তাছাড়াও আপনার ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। সহজশর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ না পেলে পণ্য মূল্য বেড়ে যেতে পারে। কারণ অতিরিক্ত সুদের জন্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

৬। সরকারী সংস্থা ব্যবসায় বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, দেশে কি কি ধরনের ব্যবসা করা যাবে অথবা যাবে না, আয়কর হার, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে সরকারী সংস্থাসমূহ। কাজেই প্রতিনিয়ত আপনার ব্যবসা সরকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হবে। যেমন, সরকার যদি আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দেয় তাহলেও পণ্য মূল্য বেড়ে যেত পারে। কারণ যদি কাঁচামাল আমদানি করতে হয তাহলে অতিরিক্ত মূল্য উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিবে।

৭। সর্বোপরি শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালক পর্ষদকে সরাসরি প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। যদি আপনার ব্যবসা লিমিটেড কোম্পানি হয় তাহলে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারগণ ব্যবসায়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।

পরোক্ষ প্রভাব বিস্তাকারী উপাদান : আপনি আগেই জেনেছেন যে, সংগঠনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন উপাদান প্রভাবের মাধ্যমে সংগঠনকে প্রভাবিত করাই হলো পরোক্ষ প্রভাব। যেমন, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি।

উপরের উপাদানগুলো আপনার ব্যবসাকে সরাসরি প্রভাবিত না করলেও, পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সংস্কৃতিগত এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আপনার ক্রেতাদের প্রভাবিত করবে কোন একটি বিশেষ ফ্যাশনের কাপড় পরিধানের জন্য। ফলে ক্রেতার চাহিদা নিরূপন করে, আপনিও সে ধরনের পোশাক প্রস্তুতের সকল ব্যবস্থা

গ্রহণ করবেন। যেমন- সময়ের সাথে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে, যা প্রভাব ফেলছে এখানকার জীবনযাত্রায়। ফলে ব্যবসায়ের সরাসরি প্রভাবিত না হয়েও পণ্যের ধরন পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছেন। তেমন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলোও একই ভাবে আপনার সংগঠনকে প্রভাবিত করবে। বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব এদেশের রাজনীতিতে এবং অর্থনীতিতে পড়বেই। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাজারে টিকে থেকে মুনাফা আয়ের জন্য সেভাবেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান

Elements of Management Environment in Bangladesh

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিবেশও প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক বিভিন্ন ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। পরিবেশের এ উপাদানগুলো শিল্পোদ্যোগের উপর কখনো অনুকুল কখনো প্রতিকুল প্রভাব বিস্তার করে। নিচে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ: বাংলাদেশে নদ-নদী, জলবায়ু ও মৃত্তিকা কৃষিকাজের উপযোগী হওয়ায় শিল্প পণ্য ও ভোগ্য পণ্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও প্রকৃতি থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর, কঠিন শিলা ও শ্বেত মৃত্তিকা শিল্পের কাচাঁমাল ও শক্তি সম্পদের যোগান দিচ্ছে। বিশাল সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল লবন শিল্প ও পর্যটন শিল্পের সহায়ক। দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর ও জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য উৎপাদিত হচ্ছে যা দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। প্রাণীজ সম্পদের মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদির মাংস ও হাস-মুরগির মাংস ও ডিম বিক্রি করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করছে। এছাড়া পশুর চামড়া রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। দেশের মোট আয়তনের ১৩% বনভূমিতে প্রাপ্ত কাঠ, বাঁশ, বেত, গোলপাতা, মধু ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে হস্ত ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে।

২। সামাজিক পরিবেশ: সামাজিক পরিবেশের বেশিরভাগ উপাদানই বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে সহায়ক। কেননা এদেশের মানুষ জাতিগত ও ঐতিহ্যগতভাবে উদার, পরিশ্রমী ও সৃজনশীল। জাহাজ নির্মান শিল্প ও মসলিন কাপড় উৎপাদন তাদের পরিশ্রম ও সৃজনশীলতারই স্বাক্ষর। ছোট বড় উদ্যোক্তা এখানে নতুন নতুন ধ্যান ধারনা নিয়ে নতুন কিছু করার জন্য এগিয়ে আসছে। শিল্পের বিকাশে এটি ইতিবাচক দিক।

৩। সাংস্কৃতিক পরিবেশ: বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগে তথা শিল্প-বাণিজ্যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো খুব একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে জ্ঞান বিজ্ঞান ও গবেষনার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির। দিন দিন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়িক ও ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্মেষ ঘটছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো শিল্প বিকাশে ব্যাপক সহায়ক হবে।

৪। অর্থনৈতিক পরিবেশ: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো শিল্প ও ব্যবসায় স্থাপনের জন্য প্রতিকূলই বলা চলে। জনগণের মাথাপিছু আয় কম, তাই সঞ্চয়ও কম। সঞ্চয় কম তাই বিনিয়োগও কম। গ্রামীন জনগনের ব্যাংকিং সেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক জটিলতা, দালালদের হয়রানি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থা শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে। তবে আশার কথা এই যে সম্প্রতি সস্তা শ্রম ব্যবহার করে তৈরি পোশাক শিল্প উন্নতি করছে এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী এখানে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে।

৫। রাজনৈতিক পরিবেশ: বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে তেমন সহায়ক নয়। অনুকুল শিল্প ও বাণিজ্য নীতি, উদার সরকারি নীতি, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক ইত্যাদি উপাদান ব্যবসায়ের সহায়ক হলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শ্রমিক অসন্তোষ, সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাব ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে।

৬। আইনগত পরিবেশঃ দেশে আইনগত পরিবেশের কিছু উপাদান আধুনিক ও যুগোপযোগী হলেও অধিকাংশ আইনই পুরানো এবং অকার্যকর। তথাপি শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব আইন প্রণয়ন, পরিবেশ সংরক্ষন ও ভোক্তা আইন এবং দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্প বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ সম্ভব।

৭। প্রযুক্তিগত পরিবেশঃ বর্তমানে বৃহদায়তনের যুগে যে কোন ব্যবসায় বা শিল্পের উন্নয়ন দক্ষ কারিগর, আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে দক্ষ কারিগর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের যেমন স্বল্পতা রয়েছে তেমনি রয়েছে এদের ব্যবহার ও সিমাবদ্ধতা। ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

৮। ধর্মীয় পরিবেশঃ বাংলাদেশে মুসলিম অধুষিত এলাকা হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ধর্মীয় পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যেমন আধিক্য রয়েছে তেমনি রয়েছে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ও ধর্ম ভীরু মানুষ। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভুতিতে আঘাত লাগে এমন কোন শিল্প স্থাপন এখানে অসম্ভব।

৯। আন্তর্জাতিক পরিবেশঃ বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলো ক্ষেত্র বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সাপটা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৭১ টি পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি রপ্তানির সুত্র ধরে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবেশের সংজ্ঞা , ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ , বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান বিবরণ খাতায় লিখুন এবং আপনার জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপঃ

ইউনিট ৩, এ আলোচনা করা হয়েছে ব্যবস্থাপনার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ বা গোষ্ঠী (যাদের ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে) হচ্ছে সরকার, মালিক, কর্মচারী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী, ব্যবস্থাপনা সমিতি ও সাধারণ ভোক্তা)। অতএব এদের প্রতি বিবিধ দায়িত্বই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সার্বিক সামাজিক দায়িত্ব।

পাঠ-৩.২ ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব

Impact of Economic, Political Environment on Management/Business

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের উপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব

Impact of Economic Environment on Management/Business

উন্নয়নশীল দেশে ব্যবস্থাপনা শ্রেনির স্বল্পতা রয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হলো সংখ্যাগুরু শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির উপস্থিতি। এই শ্রেণি সময়ের অগ্রগতির সাথে আস্তে আস্তে গড়ে উঠে। তবে প্রশিক্ষন, প্রশাসনিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক উৎসাহ ও ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির সংগঠন ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক পরিবেশ বহুমূখী। এমতাবস্থায় নিচে কতিপয় অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সেগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১। **শিল্প-বিনিয়োগ নীতিঃ** ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প-বিনিয়োগ নীতি ব্যবসায়ীর কাছে একটি দিক নির্দেশনা দলিল। এতে শিল্পোন্নয়নের প্রত্যাশিত কাঠামো, মূলধন সংগ্রহের উৎস ও উপায়সমূহ, বিনিয়োগ সেবা, কর কাঠামো, ব্যবসায় অথবা কারখানার জন্য ভূমির প্রাপ্যতা, অগ্রাধিকারযুক্ত খাত চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে। একজন আগ্রহী শিল্পোদ্যোক্তা শিল্পনীতি পাঠ করে তার প্রত্যাশিত প্রকল্পের ধারনা, মূলধন সংগ্রহের উপায় জানতে পারে। অধিকন্তু, কোন খাতে কোথায় কিভাবে বিনিয়োগ করলে কর রেয়াত পাওয়া যাবে তাও জানতে পারে।

২। **প্রতিষ্ঠানের মূলধন প্রাপ্তিঃ** একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে বিভিন্ন প্রকার মূলধন প্রয়োজন হয়। আর এই মূলধনের উৎস হচ্ছে ব্যাংক, শিল্পোদ্যোক্তা, শেয়ার বাজার, বিদেশি সাহায্য প্রভৃতি। প্রারম্ভিক মূলধন প্রাপ্তি অথবা এর সহজলভ্যতা একটি নতুন ব্যবসায় শুরুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উপরন্তু, চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং সম্প্রসারনের জন্যেও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন অথবা ঋণের প্রয়োজন পড়ে। কোন জায়গায় প্রতিষ্ঠানের এই মূলধন প্রাপ্তির সুযোগ অনুপস্থিত থাকলে শিল্পোদ্যেক্তাগণ অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে।

৩। **মুদ্রানীতিঃ** মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মুদ্রা সরবরাহ, জনগনের প্রকৃত মজুরি ও মুদ্রাস্ফীতি স্থিতিশীল রাখা। উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুদের হার নমনীয় রাখা, বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা মুদ্রানীতির অন্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি সুষ্ঠু এবং ফলপ্রসূ মুদ্রানীতি ব্যবসায়ের পরিবেশকে উন্নত করে।

৪। **রাজস্ব নীতিঃ** সুষ্ঠু এবং সুবিধাজনক রাজস্ব আইন ও নীতিমালা নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে, প্রতিকূল রাজস্ব নীতিমালা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও বিকাশ এবং নতুন শিল্প স্থাপনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। হাবিবুল্লাহ ও আহমেদ এক গবেষনায় দেখিয়েছেন, ত্রুটিপূর্ণ রাজস্ব নীতির ফলে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে কাচাঁমাল আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করা এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত আমদানি করা পণ্যের উপর কমহারে শুল্ক ধার্য করা ইত্যাদি ত্রুটিসমূহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই ত্রুটিপূর্ণ রাজস্ব নীতি স্থানীয় পণ্যের বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে ব্যয় ও মূল্যের উপর বাধা-বিপত্তি হয়ে দেখা দেয়।

৫। যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধাঃ সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ও এদের মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান যা ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে। যেমন মাহার ও কডিংটন উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে বিমান যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্ক্যারি উল্লেখ করেন শিল্পের প্রকৃতি, প্রতিযোগিতা, সাধারন ও বিশেষ অবস্থান, প্রতিষ্ঠানের আকার, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার, শক্তির প্রাপ্যতা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান ইত্যাদি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি অগ্রগতিতে অনুকূল পরিবেশ হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৬। ভূমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্যতাঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, যেমন: ভূমি, শ্রম, শক্তি ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। এ সকল সুযোগ-সুবিধার সহজ প্রাপ্তি অথবা এদের অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও উন্নয়নের উপর অনুকূল অথবা প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। শক্তির যোগানের অনিশ্চয়তা, শিল্প বন্ড তথা ঋণপত্রের অনুপস্থিতি, আকাশচুম্বী আবাসিক খরচ ইত্যাদিও শিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। উন্নত শিল্প এলাকাও শিল্পের উন্নতির জন্য সহায়ক। কারন উন্নত শিল্পাঞ্চলে পানি, শক্তি, পয়ঃপ্রনালী, উন্নত রাস্তাঘাট প্রভৃতি অবকাঠামো আগে থেকে তৈরি থাকে বলে শিল্পোদ্যোক্তাকে এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না।

৭। কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তিঃ শিল্পোদ্যোক্তার কার্য সম্পাদনে আরেকটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তির উপস্থিতি।১৯৬২ সালে ষ্ট্যান্ডফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষনার উপসংহারে বলা হয়েছে- বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানার স্থানীয়করনে দক্ষতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া আরও দেখা গেছে, পুরাতন স্থান থেকে নতুন স্থানে শিল্প কারখানা স্থানান্তর করা হলে পুরাতন স্থানের দক্ষ শ্রমিকরা নতুন স্থানে যেতে আগ্রহ দেখায় না।

৮। সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগের সুবিধাঃ কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগের সুবিধা যে কোন শিল্পোদ্যোক্তার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। কুপার, স্যাপেরো, স্কুল হ্যামার, করিলফ প্রমুখ লেখকগণ এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীদের সাথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

৯। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরও শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ নির্ভর করে। দেশটিতে মুক্ত অর্থনীতির অর্থাৎ কেবলমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলে সেখানে শিল্প বাণিজ্যের জন্য একটি সহায়ক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বিরাজ করে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকগণ মুনাফা অর্জনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেন তবে তার সাথে সাথে কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন।

১০। অর্থনৈতিক গতিশীলতার ধারাঃ অর্থনৈতিক গতিশীলতা বলতে মাথাপিছু উৎপাদন, জাতীয় আয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হারকে বুঝায়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনুকূল হলে সেখানে মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। আবার, কোন বিশেষ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে সেই ক্ষেত্র মূলধন বিনিয়োগের হার ও শিল্পোদ্যোগ বিকশিত হয়। উদাহরন হিসেবে বলা যায়, নব্বইয়ের দশকে কৃষি ব্যবসায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা দিলে পোলট্রি, ফিসারিজ এবং সংশিল্ট ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংখ্যক খামার গড়ে উঠে। বর্তমানে এসকল খাতে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে। আর গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ধারার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হতে চলেছে।

ব্যবসায়ের উপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব

Impact of Political Environment on Business

ব্যবসায় ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। দেশের রাজনীতির দর্শন, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক গতিশীলতা শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি প্রচলিত সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতি হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প স্থাপনে আকৃষ্ট হয় না। নিচে রাজনৈতিক পরিবেশের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো।

১। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাঃ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্প অথবা ব্যবসায় পরিবেশের পূর্বশর্ত। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা অবনতি ঘটে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে দেশে সন্ত্রাসী ও দুষ্ট শ্রেণি সৃষ্টি হয়ে ব্যবসায়ীদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এই পরিস্থিতিতে কোন উদীয়মান শিল্পোদোক্তা শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায় না, ব্যবসায় স্থাপন সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে না।

২। ব্যবসায় ও সরকারের সম্পৃক্ততাঃ রাজনৈতিক ব্যাক্তিরা অনেক সময় নিজের অথবা দলীয় স্বার্থে কোন কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। প্রতিদিন হিসেবে এরা সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। এই অবস্থায় শিল্পোদ্যোগীয় গুনসম্পন্ন ব্যক্তিরা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এতে শিল্পোদ্যোগের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। তাই, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সরকারের মধ্যে পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকলে ব্যবসায়ের পরিবেশ অনুকূল হয়।

৩। অর্থনৈতিক নীতিমালাঃ প্রায়শই দেখা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করের কাঠামো, পুরানো কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করার প্রস্তাব আসলেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বণিক সভা, ব্যবসায়ী সংঘ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। উপরন্তু চিরাচরিত নিয়মে সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের অর্থনীতির উপর অনুকূল ও প্রতিকুল প্রভাব এবং বিশেষ করে শিল্প-বাণিজ্যের উপর প্রভাব সম্পর্কে ব্যবসায়িক সংঘসমূহ জোরালো বক্তব্য পেশ করে।

৪। সরকারের রাজস্বনীতিঃ ব্যবসায়ের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু গবেষক ও শিক্ষাবিদ স্ষ্টত দেখিয়েছেন, সরকারের নীতিমালা বিশেষ করে কর হার, লাইসেন্স নীতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি কার্য উদ্যোগ ও কার্যক্রমের উপর অনুকূল অথবা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। দেশে উৎপাদিত পণ্যের বিদেশে বাজার পাবার জন্যও সরকারের প্রচেষ্টা ও সমর্থন প্রয়োজন। তাছাড়া শুল্ক বিভাগ, কর বিভাগ ও যোগাযোগ বিভাগের সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবসায়ের সফলতার জন্য অপরিহার্য।

৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবঃ বর্তমান সময়ে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিভিন্ন দেশের জন্য একটি সাধারন বৈশিষ্ট্য। তবে বিভিন্ন দেশে এর ব্যপ্তি ও প্রকৃতি সরকারের বৈশিষ্ট্যর অন্য কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। মিশ্র অর্থনীতিতে বিশেষ করে যেই সকল দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য রয়েছে সেখানে কখনও কখনও বলা হয় সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরন করেছে।

৬। আন্তর্জাতিক বাজারঃ আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসায়ীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সরকার এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। কারন কোন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত না হলে ব্যবসায়িক সম্পর্কও উন্নত হয় না। নতুন বৈদেশিক বাজার অনুসন্ধান, বিদেশে বাণিজ্য মেলার আয়োজন, দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিদেশের বাজারে পরচিয় করিয়ে দেয়া এবং বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রচলন করার ক্ষেত্রে সরকার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব ও ব্যবসায়ের উপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

উন্নয়নশীল দেশে ব্যবস্থাপনা শ্রেনির স্বল্পতা রয়েছে যদিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হলো সংখ্যাগুরু শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির উপস্থিতি। এই শ্রেণি সময়ের অগ্রগতির সাথে আস্তে আস্তে গড়ে উঠে। তবে প্রশিক্ষন, প্রশাসনিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক উৎসাহ ও ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির সংগঠন ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক পরিবেশ বহুমূখী। ব্যবসায় ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। দেশের রাজনীতির দর্শন, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক গতিশীলতা শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি প্রচলিত সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতি হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প স্থাপনে আকৃষ্ট হয় না।

পাঠ-৩.৩ ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত, আন্তর্জাতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব

Impact of Legal, International and Technological Environment on Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত পরিবেশের প্রভাব

Impact of Legal Environment on Management

দেশের শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, পরিবেশগত আইন, শ্রম আইন, আমাদানি-রপ্তানি নীতি প্রভৃতি যেসব আইনগত বিধি বিধান পালন করতে হয় তার সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে শিল্পদ্যোগের আইনগত পরিবেশ বলে। এ আইনগত কারনেই একজন শিল্পদ্যোক্তা তার ইচ্ছামাফিক বা মনমতো শিল্প গঠন ও পরিচালনা করতে পারে না। নিচে এরূপ উপাদান শিল্পকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করা হলো:

১। **বাণিজ্যিক আইন:** দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনের আওতায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়। এই বাণিজ্যিক আইন যদি যুগোপযোগী ও সহজ প্রকৃতির হয় তবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। অন্যথায় শিল্প- বাণিজ্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সরকারকে এ ব্যাপারেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। **শিল্পীয় আইন:** দেশের আইন দ্বারাই একটি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। শিল্প আইনের কারণেই শিল্পে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ রয়েছে। তাই শিল্প আইন শিল্পোদ্যোগকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

৩। **ক্ষতিপূরণ আইন:** অগ্নিকান্ড, দূর্ঘটনা ইত্যাদির জন্য যে আইন ও বিধি-বিধান দেশে প্রচলিত আছে তাকে ক্ষতিপূরণ আইন বলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেলে শিল্পোদ্যোগ আরও বেগবান হয়। ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

৪। **শ্রম আইন:** শিল্প কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ, শ্রম বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত আইনকে শ্রম আইন বলা হয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান শ্রম আইন ২০০৬ সালে প্রণীত হয় যা ২০০৯ ও ২০১০ সালে কিছুটা সংশোধন করা হয়।

৫। **পরিবেশ সংরক্ষণ আইন:** ব্যবসায়ীগণ শুধু পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন করে পরিবেশ সংরক্ষন আইনও মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষন আইন অনুসরণ করা হয়।

৬। **মজুরি আইন:** শ্রমিকদের মজুরি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা মজুরি আইনের অন্তভূর্ক্ত। কারখানা মালিকগণও আইন অনুসারে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করতে বাধ্য থাকেন। এ আইন শিল্পোদ্যোক্তাদের অনুকূল থাকলে তারা নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে বেশি আগ্রহী হয়। ফলে শিল্পের বিস্তার ঘটে।

৭। বিনিয়োগ নীতি: দেশীয় ব্যবসায়কে সংরক্ষণের নীতিমালা ও দেশের ব্যবসায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। যেমন: ভারত চীনের সংরক্ষিত অর্থনৈতিক নীতিমালার কারনে অবাধে বিদেশি পণ্য এদেশ দু'টিতে প্রবেশ করতে পারে না। এতে তাদের দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও সংরক্ষনে সহায়তা হচ্ছে।

৮। শিল্প নীতি: সরকারের অতীত ও বর্তমান শিল্প নীতি ব্যবসায়কে প্রভাবিত করে। সরকার কোন কোন খাত কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে, আর কোন ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করছে ইত্যাদি শিল্প নীতিতে আলোকপাত করা হয়। সুতরাং শিল্প স্থাপনের পূর্বে উদ্যেক্তা অবশ্যই শিল্প নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন ও এর আলোকে শিল্প স্থাপন বা স্থান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন।

৯। আন্তর্জাতিক আইন: প্রত্যেক দেশেই ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের প্রচলন থাকে। এসকল আইন ও আন্তর্জাতিক আইন ব্যবসায় বান্ধব হলে সে দেশের ব্যবসায়ীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায়ের প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধন করতে পারে। এজন্যই বিশ্বের উন্নত ও প্রভাবশালী দেশসমূহ তাদের দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুকূল আইন প্রনয়নে সচেষ্ট থাকে।

ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব

Impact of Technological Environment on Management

বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, এতদসংক্রান্ত গবেষনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে। এ প্রযুক্তিগত পরিবেশ ব্যবসায়ের ধারা ও গতি প্রকৃতিকে দ্রুতই পরিবর্তন করে দিতে পারে। আর এর ফলেই কম খরচে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। শিল্প বিপ্লবের পিছনেও ছিল মূলত এ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রভাব। চীন, জাপান, ব্রিটেনসহ অন্যান্য উন্নত দেশের ব্যবসায়িক সাফল্যের মূলেও রয়েছে এ প্রযুক্তিগত পরিবেশ। বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন নতুন তত্ত্ব ও জ্ঞানের আবিষ্কার ঘটে, আর প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও জ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা হয়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কম খরচে উন্নত মানের নতুন নতুন পণ্য ও সেবার উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ব্যবসায়ের পরিধিও অনেক প্রসার ঘটেছে। নিচে ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা: কারিগরি শিক্ষা বলতে হাতে কলমে শিক্ষাকে বুঝায়। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ বিদ্যমান থাকলে দেশে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী সৃষ্টি এবং দক্ষ শ্রমিক-কর্মী সহজলভ্য হয়। যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার রয়েছে সেখানে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সহজেই গড়ে উঠে ও বিদ্যমান শিল্পের সহজ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়। ফলে একটি ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ গড়ে উঠে। অপরদিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে ব্যবসায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা যায়।

২। বিজ্ঞান ও গবেষনাধর্মী প্রতিষ্ঠান: বিজ্ঞান ও গবেষনাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের কারনে নতুন নতুন কলা-কৌশল আবিষ্কার ও ব্যবহার সহজতর হয়। দেশের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে সময়োপযোগী ও স্থানোপযোগী প্রযুক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্ভব হয়। এর ফলে ব্যবসায়ের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। এছাড়া নতুনত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ধারা বহাল থাকলে ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হয় এবং পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য ধরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ে নতুন ধারা সংযোজন করার সুযোগ তৈরি হয়।

৩। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকারী ও সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান: উন্নত প্রযুক্তি উৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত করে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান নতুন ও আকর্ষণীয় পণ্য উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ সব প্রযুক্তি বিবেচনায় আনতে হয়।

৪। প্রযুক্তি আমদানির সুযোগঃ দেশে উন্নত ও নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি আমদানি করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি আমদানির জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা বিবেচনাপূর্বক একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায় স্থাপন বা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

৫। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থাঃ দেশে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা দক্ষ কর্মী গঠনে এবং পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর দক্ষ কর্মী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এগুলোর সহজলভ্যতা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে বেগবান করে।

ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব

Impact of International Environment on Management

একটি দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিবেশ অন্যদেশের ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডের দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়, তাকেই আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলে। বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। কারন বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রভাব গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নিচে ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করা হলো:

১। বিশ্ব মানুষ ও পরিবেশঃ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাপনের প্রণালী তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনধারার মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা প্রধানত নির্ভর করে তার পরিবেশের পার্থক্যের উপর। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি সাধারনত মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। মানুষের এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা পৃথিবীর সকল দেশেই তার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

২। বিশ্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশও বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে মানুষ বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয়ে পৃথকভাবে সংস্কৃতির সৃষ্টি করতো। সে সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই বিশুদ্ধ সংস্কৃতি বা অবিমিশ্র সংস্কৃতি আর নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। অনেক সময় আবার স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তবে যে দেশে বৈদেশিক সংস্কৃতি আনীত হয় সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আনীত সংস্কৃতির সাথে স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মীক যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন অন্যথায় একদেশের সংস্কৃতি অন্যদেশে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করলে সুফলের চাইতে কুফলই বেশি দেখা যায়।

৩। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অনুসন্ধান করাই বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপই প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদ সংক্রান্ত কার্যকলাপ। মানুষের এ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে গড়ে উঠে না। প্রথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে এ ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টির যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনই সাদৃশ্যও দেখা যায়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারে নানাবিধ তারতম্য দেখা যায়। বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে পৃথিবীর ধনী দেশ বিশ্ব ব্যবসায় নিয়ন্ত্রন করে থাকে। অনেক সময় আবার ধনী দেশের অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে ছোট ছোট দেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কেননা ধনী দেশের পুজিই গরিব দেশে বিনিয়োগ হয়। এ লক্ষ্যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

৪। বিশ্ব ব্যবসায় পরিবেশঃ একটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে পৃথিবীর ঐ দেশের ভৌগলিক পরিবেশের উপর বেশি প্রভাব পড়ে। কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি অথবা অবনতি দেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

থাকে। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথা পৃথিবীর যে কোন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর দেশের ভৌগলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরদিকে বর্তমান বিশ্বায়নের প্রভাব সারা বিশ্বে ব্যবসায় পরিবেশ প্রতিযোগি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ধনীকে দেশের বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মুষ্টিময় দেশ বিশ্ব ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে, প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। ফলে গরিব দেশের ব্যবসায়ী পরিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। অপরদিকে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর প্রযুক্তি তথা ব্যবসায়-বাণিজ্যের খোঁজখবর নেয়া সহজসাধ্য হচ্ছে।

৫। বিশ্ব প্রযুক্তিগত পরিবেশঃ বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও উন্নত ধরনের পদ্ধতি উদ্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ যে দেশ যত বেশি প্রযুক্তিগত শিক্ষা উন্নত দেশের প্রযুক্তিগত পরিবেশও ততই অনুকূল। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। উন্নত প্রযুক্তিতে যে সকল দেশ বেশি উন্নত হয়েছে সে দেশ ব্যবসায় বাণিজ্যেও একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছে। যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। জাপান নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার কতিপয় মিত্রদেশ সারা বিশ্বের এনার্জি সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। ফলে ধনী দেশগুলো আরো ধনী হচ্ছে, গবির দেশগুলো আরো গরিব হচ্ছে।

৬। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবেশঃ যে পরিবেশর মাধ্যমে বিশ্বের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় তাকে বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবেশ বলে। যে দেশে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দেশে অনুকুল ব্যবসায়ী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে কোন দেশে যদি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বজায় থাকে সে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য এমনকি উন্নয়নও বাধাগ্রস্থ হয়। বিশ্ব রাজনীতির ফলে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সুন্দর থাকে। সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশের কারনেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয় । বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরাজয়ের ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে হানাহানির রাজনীতি। অপরদিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ব্যবাসয়ীক উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবীর অনেক দেশকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থের কারনে ধনী দেশগুলো যা বলছে গরিব দেশগুলো তাই শুনছে।

৭। বিশ্ব আইনগত পরিবেশঃ পৃথিবীর যে কোন দেশে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে- সে দেশের আইন-শৃঙ্খলা অর্থাৎ বিশ্বের কোন দেশে যদি স্থিতিশীল সরকার প্রীতষ্ঠিত হয় তাহলে অনুকুল ব্যবসায় পরিবেশও গড়ে উঠে। সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলার অভাবে ব্যবস্থাপনায় নানা প্রকার অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। আবার একেক দেশে একেক ধরনের আইনের শাসন কায়েম করা হয়। এ আইনের ফলে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অতএব, আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন আইন প্রণীত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে একই ধরনের আইনগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: কারখানা আইন, পরিবেশ সংরক্ষন আইন, শ্রম আদালত, শিশু শ্রম বন্ধের আইন, আন্তর্জাতিক আদালত, আন্তর্জাতিক সীমানা আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, নারী নির্যাতন বন্ধের আইন, এসিড নিক্ষেপ আইন এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত জাতিসংঘ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রবর্তন করে বিভিন্ন সদস্য দেশগুলোকে উক্ত আইন মেনে চলার বিধান জারি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত পরিবেশের প্রভাব, আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন, ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করে একটি চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপঃ

দেশের শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, পরিবেশগত আইন, শ্রম আইন, আমাদানি-রপ্তানি নীতি প্রভৃতি যেসব আইনগত বিধি বিধান পালন করতে হয় তার সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে শিল্পদ্যোগের আইনগত পরিবেশ বলে। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, এতদসংক্রান্ত গবেষনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত পরিবেশকে ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলে। একটি দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিবেশ অন্যদেশের ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডের দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়, তাকেই আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলে। বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। কারন বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রভাব গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঠ-৩.৪ ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝায়? ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা

What is Meant by Social Responsibility of Management? Social Responsilities of Management, Degree of Social Responsibility in Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রাব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝায়?

What is Meant by Social Responsibility of Management?

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজে সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজে বিভিন্ন পক্ষ থাকে। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। সমাজে বিভিন্ন পক্ষ রয়েছে, যেমন– উৎপাদনকারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, মালিক প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই সমাজের প্রতি কিছু না কিছু অবদান রাখে এবং দায়িত্ব পালন করে। সমাজে অবস্থানরত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদিও মুনাফা অর্জনই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি সমাজের কল্যাণ সাধন করাও এর অঙ্গীকার। সুতরাং সামাজিক কল্যাণ সাধনের প্রতি ব্যবস্থাপনার অঙ্গীকারকে ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বুঝায়। ব্যবস্থাপনা সমাজের মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে এটিই ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব।

Bartol & Martin বলেন, "প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব হল প্রতিষ্ঠানের সেই সকল কার্যক্রমের প্রতি দায়বদ্ধতা যা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধিত হয়।" (Organizational social responsibility refers to the obligation of an organization to actions that protect and importance the welfare of society along with its own interests.)

Weihrich & Koontz-এর মতে, "ব্যবস্থাপকদের সামাজিক দায়িত্ব বলতে ব্যবস্থাপকদের সামাজিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জন করাকে বুঝায়।" (Social responsibility of managers means the responsibility of managers in carrying out and their socially approved missions)

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশেণ্ডষণ করে ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন–

(i) এটি সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

(ii) এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ব্রতী হয়।

(iii) এটি সামাজিক উপাদানসমূহের প্রতি সাড়া দেয়।

সুতরাং ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব হল সমাজে অবস্থিত বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা যাতে সমাজের সংশিণ্ডষ্ট সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব

Social Responsilities of Management

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ বা গোষ্ঠী যাদের প্রতি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে তারা হচ্ছে সরকার, মালিক, কর্মচারী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী ও সাধারণ ভোক্তা। সুতরাং এদের প্রতি বিবিধ দায়িত্বই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সার্বিক সামাজিক দায়িত্ব। সচরাচর ব্যবস্থাপনা যে সব সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে সেগুলো হলোঃ

(১) ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মালিক পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, তাদের সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার এবং অর্জিত মুনাফার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে।

(২) শ্রমিক কর্মচারীদের খেয়াল খুশির সাথে ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। শ্রমিকরা সমাজেরই লোক। সুতরাং তাদের কল্যাণের জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।

(৩) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রভূত্ব মূলক মনোভাব পরিহার করে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ব্যবস্থাপনার আরও একটি সামাজিক দায়িত্ব।

(৪) অন্য একটি দায়িত্ব হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রাজস্ব খাতে আয়কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।

(৫) ব্যবস্থাপনা আরও একটি কাজ করে তা হলো, জনগণ তথা ভোক্তা শ্রেণীর চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই চাহিদা পুরণের চেষ্টা করা।

(৬) পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চারিদিকের জনগণ প্রতিষ্ঠান হতে অনেক সমাজ কল্যাণমূলক সেবা ও কার্যাদী আশা করে। তাই ব্যবস্থাপনা পারিপার্শ্বিক সমাজের জন্য রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

(৭) ব্যবস্থাপনা সমাজে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ করে, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়া, মেধাবী ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন রকম দেশী বিদেশী খেলার স্পনসর হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি।

(৮) ব্যবস্থাপনা আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করে।

(৯) ব্যবস্থাপনা কার্যদক্ষতার সাথে পরিচালিত হোক ব্যবস্থাপনা সংঘ প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা হতে তাই কামনা করে। সুতরাং পেশাগত মান উন্নয়নও ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।

(১০) দেশের জনগণের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক দায়িত্ব। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করে নতুন নতুন শিল্প কারখানা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে দেশের তথা সমাজের বেকার সমস্যা হ্রাস করতে পারে।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা

Degree of Social Responsibility in Management

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ বা গোষ্ঠী (যাদের ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে) হচ্ছে সরকার, মালিক, কর্মচারী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী, ব্যবস্থাপনা সমিতি ও সাধারণ ভোক্তা)। অতএব এদের প্রতি বিবিধ দায়িত্বই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সার্বিক সামাজিক দায়িত্ব। নিম্নে ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলোঃ

(১) **মালিক শ্রেণির প্রতি দায়িত্বঃ** মালিক বলতে অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ, এক-মালিকানাধীন কারবারের একাধিপতি এবং যৌথ মূলধনী কোম্পানীর শেয়ার মালিকগণকে বুঝায়। ব্যবস্থাপকগণ মালিক কর্তৃক নিয়োজিত হন। তারা মালিকদের পক্ষে আমানতকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন করেন। মালিকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অর্জিত মুনাফার সুষ্ঠু বন্টন, প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন, মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এমন

কোন কার্য সম্পাদন না করা যাতে মালিক শ্রেনীর ন্যায্য স্বার্থেও ব্যাঘাত না ঘটে। মালিক শ্রেণীর প্রতি এ সকল দায়িত্ব পালন করলে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে।

(২) **শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি দায়িত্বঃ** শ্রমিকদের খেয়াল খুশির সাথে ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। শ্রমিকরা সমাজেরই লোক। সুতরাং তাদের কল্যানের জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বকে নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা যায়ঃ

(ক) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব। প্রশিক্ষনের ফলে শ্রমিকরা অল্প পরিশ্রমে ও স্বল্পতম ব্যয়ে সর্বাধীক উৎপাদন করতে পারবে। এতে সমাজের লোকরাও পরিনামে উপকৃত হবে।

(খ) উপযুক্ত মজুরীঃ শ্রমিকদের মূলধন হল কায়িক পরিশ্রম। তাদের এ পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা ব্যবস্থাপনার একটি মহৎ, নৈতিক ও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। ন্যায্য ও ন্যায়সংগত মজুরী পেলে শ্রমিকরা সুখে-স্বাচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে পারবে। শ্রমিক শ্রেণী সমাজেরই অংশ। তাই তাদের মঙ্গল সাধন করার অর্থ সমাজেরই মঙ্গল সাধন করা।

(গ) অন্যান্য সুযোগ সুবিধাঃ শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, সম্ভাব্য পদোন্নতির বিধান রাখা, চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেয়া এবং পরিবার পরিজনের শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব। এ সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে শ্রমিকদের মনোবল, নৈতিকতা ও কার্যের প্রতি আগ্রহ এবং সংগঠনের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। সমাজে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

(৩) শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সুসর্ম্পক স্থাপনঃ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠান এর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ধাবিত হয়। এদের একটি অপরটি ব্যতীত অচল ও অসার। অতএব প্রভূত্বমূলক মনোভাব পরিহার করে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।

(৪) নতুন নতুন কর্মসংস্থানঃ দেশের জনগণের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান করা আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনা প্রজ্ঞাপূর্ণনীতি নির্ধারণ করতঃ নতুন নতুন শিল্প কারখানা, প্রকল্প ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করতে পারে।

(৫) ভোক্তাদের মঙ্গল সাধনঃ অর্তনৈতিক সম্পদসমূহের সুষম ব্যবহার করে ভোক্তাদের জন্য ন্যায্যমূল্যে পণ্য সামগ্রী ও সেবা কার্যাদী সরবরাহ করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। পণ্যের বিক্রয় মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজের জনগন সস্তায় উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করে সহজেই তাদের অভাব অনটন মেটাতে পারে। অপরদিকে কারবারি প্রতিষ্ঠান এর বিক্রয়ের পরিমান বাড়িয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

(৬) কাচাঁমাল সরবরাহকারীদের প্রতি দায়িত্বঃ অধিকাংশ শিল্পে ব্যবহৃত কাচাঁমাল সাধারনত কৃষকরাই উৎপন্ন করে থাকে। ব্যবস্থাপনা স্বল্পতম মূল্যে কাচাঁমাল ক্রয় করতে চাইলেও স্বরণ রাখতে হবে যে, দরিদ্র কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত করে পুঁজিপতি বণিক শ্রেণির জন্য অধিক মুনাফা নিশ্চিত করা কোনক্রমেই যুক্তিসংগত নহে। উপরন্তু কাচাঁমাল সরবরাহকারিদের সাথে ব্যবস্থাপনার এমন কোন ব্যবস্থায়িক চুক্তি সম্পাদন সমিচিন নহে। যা দ্বারা সরবরাহকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব, কাচাঁমালের উপযুক্ত মূল্য প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহকারীদের স্বার্থ রক্ষা করাও ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব।

(৭) প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বঃ পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চারিপাশে জনগণ কারবারি প্রতিষ্ঠান হতে অনেক সমাজ কল্যানমূলক সেবা ও কার্যাদি আশা করে। কারখানার ধোয়া, বাষ্প ও গোলোযোগপূর্ণ শব্দের ফলে পারিপাশ্বিক নাগরিক জীবন যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখিন না হয় ব্যবস্থাপনাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবস্থাপনা পারিপাশ্বিক সমাজের জন্য, রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারে।

(৮) ব্যবস্থাপনা সংঘের প্রতি দায়িত্বঃ ব্যবস্থাপনা কার্য দক্ষতার সাথে পরিচালিত হোক ব্যবস্থাপনা সংঘ' প্রতিষ্ঠানিক ব্যস্থাপনা হতে তাই কামনা করে। সুতরাং পেশাগত মান উন্নয়নও ব্যবস্থাপনার অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।

(৯) সরকারের প্রতি দায়িত্বঃ কারবার পরিচালনার জন্য সরকারই প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং বিনিময়ে কারবারী প্রতিষ্ঠান হতে ন্যায্য কর ও গণমুখী কার্যবলী আশা করে। সুতরাং ন্যায্য কর প্রদান করা এব বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যানমূলক কার্যে অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনার একটি মূখ্য দায়িত্ব।

পরিশেষে বলা যায় যে সসীম সম্পদকে যতাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যান সাধনই ব্যবস্থাপনার মৌলিক সামাজিক দায়িত্ব। কারণ দেশ ও এর জনগনই ব্যবস্থাপনাকে তার ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা বর্ণনা করে একটি চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ:

সামাজিক কল্যাণ সাধনের প্রতি ব্যবস্থাপনার অঙ্গীকারকে ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বুঝায়। ব্যবস্থাপনা সমাজের মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে এটিই ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব।ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ বা গোষ্ঠী যাদের প্রতি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে তারা হচ্ছে সরকার, মালিক, কর্মচারী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী ও সাধারণ ভোক্তা। সুতরাং এদের প্রতি বিবিধ দায়িত্বই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সার্বিক সামাজিক দায়িত্ব। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ বা গোষ্ঠী (যাদের ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে) হচ্ছে সরকার, মালিক, কর্মচারী, সরবরাহকারী, প্রতিবেশী, ব্যবস্থাপনা সমিতি ও সাধারণ ভোক্তা)। অতএব এদের প্রতি বিবিধ দায়িত্বই হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সার্বিক সামাজিক দায়িত্ব।

পাঠ-৩.৫ ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে- বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

Arguments in Favor and Against of Social Responsibility in Management

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে যুক্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে যুক্তিসমূহ

Arguments in Favor of Social Responsibility in Management

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। বিশেষ করে অন্তঃবৃত্তিক ও মধ্যবৃত্তিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন বিতর্ক না থাকলেও বহিঃবৃত্তিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই বির্তকের অবতারনা করে থাকেন। ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই বির্তকের অবতারনা করে থাকেন। ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান, ওয়াল্টন ও থিউডোর লেভিট। রবার্ট এলব্যানিস অবশ্য সামজিক দায়িত্ব বিষয়টি অন্তঃবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তথা ব্যবস্থাপনার সমাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন পিটার এফ, ড্রাকার, ক্যানেগ ম্যাশন, ম্যালভিন এনসেন, আরভিং ক্রিষ্টাল ও মার্কিণ অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন। তাদের মতে, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরও অধিক ভূমিকা রাখতে হবে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদেই মধ্যবৃত্তিক ও বহিঃবৃত্তিক দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে। Keith Davis and William C. Frederick তাদের Business and Society শীর্ষক গ্রন্থে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা নিম্নরূপঃ

(১) সাম্প্রতিককালে মানুষের প্রত্ময়োজন ও আশা প্রত্যাশার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং এ কারনে বলা হয়ে থাকে যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো যেহেতু সমাজ থেকেই এদের প্রয়োজন সম্পর্কে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেহেতু সমাজের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া প্রদান করা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্যে বাঞ্চনীয়।

(২) উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হলে সমাজ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উভয়ই উপকৃত হয়ে থাকে। সমাজ উন্নত হয় সচরাচর উন্নত প্রতিবেশী ব্যবস্থা এবং অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় ভালো সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে কারণ সমাজই হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনী ও পণ্য বা সেবার চাহিদার উৎস।

(৩) কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে সরকারি বাড়তি নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ নিরুৎসাহিত হয়। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিক মাত্রায় স্বাধীনতা ও নমনীয়তা ভোগ করতে পারে।

(৪) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর যেহেতু যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু ক্ষমতার পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব থাকা বাঞ্চনীয়। বস্তুতঃ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে সমতা থাকা উচিত।

(৫) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে আন্তঃনির্ভরশীল। তাই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড বাহ্যিক পরিবেশের উপর স্বাভাবতঃই প্রভাব রাখে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়।

(৬) কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের স্বার্থেই সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়।

(৭) সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা হলে বিভিন্ন সমস্যা মুনাফায় পরিণত হতে পারে। যে সকল পণ্য এক সময় নিরর্থক বা উচ্ছিষ্ট (যেমন শীতল পানীয়ের খালি কৌটা বা পাত্র) বলে মনে হতো তা পূনরায় লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৮) সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে জনসমক্ষে কোম্পানীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সহজেই গ্রাহক, কর্মচারী ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে।

(৯) সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সকল সামাজিক সমস্যা সমাধানে অক্ষম সে সকল সমস্যার সমাধানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এগিয়ে আসা উচিত। বস্তুতঃ অভিনব ধারনা উদ্ভবের ক্ষেত্রে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এক চমৎকার ঐতিহ্য রয়েছে।

(১০) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর যথেষ্ট ধন-সম্পদ রয়েছে। তারা তাদের মেধাবী ব্যবস্থাপক, দক্ষ প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ এবং মূলধনী সম্পদ আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারে।

(১১) সামাজিক সমস্যা বা ব্যাধিগুলো নিরাময়ের চেষ্টার চেয়ে ব্যবসায় শ্রেয়। বস্তুতঃ সামাজিক অস্থিরতা মোকাবেলা অপেক্ষা বেকার সমস্যা সমাধানে অবদান রাখা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতে পারে।

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

Arguments Against of Social Responsibility in Management

ডেভিস ও ফ্রেডারিকের গ্রন্থে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের **বিপক্ষে** নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

(১) ব্যবসায় প্রকিষ্ঠানের প্রাথমিক ও মূখ্য কাজ হলো অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে মুনাফার ক্রমান্বয়িক সর্বাধিকীকরণ। সুতরাং সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া মানে অর্থনৈতিক দক্ষতা হ্রাস পাওয়া।

(২) সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বাধিকরণ বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে থাকে এবং এ জাতীয় অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

(৩) চূড়ান্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে যে অতিরিক্ত খরচ হয়ে থাকে তা পণ্য বা সেবাকর্মের দামই বৃদ্ধি করে এবং এটা সমাজ তথা ভোক্তাকেই পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ফলে ব্যবসায়ের খরচ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পায়।

(৪) সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিকভাবে লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতিকে দুর্বল করে দিতে পারে। সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার বারতি খরচ পণ্য দ্রব্যের মূল্যের সাথে যোগ হয়ে থাকে। ফলে যে সকল দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে তাদের পণ্য মূল্য তুলনামূলক বৃদ্ধি পায় এবং এ সকল দেশের কোম্পানী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পেছনে পড়ে যায়।

(৫) ব্যবসায়ীদের এমনিতেই যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, তদুপরি বাড়তি সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে আরও বৃদ্ধি করে।

(৬) ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সচরাচর সামাজিক সমস্যার মোকাবেলায় অদক্ষ হয়ে থাকে কারণ তাদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা প্রধাণতঃ অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপরেই হয়ে থাকে। সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত তাদের দক্ষতা নাও থাকতে পারে।

(৭) ব্যবসায়ের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্বহীনতা রয়েছে, আর যতক্ষন পর্যন্ত এর বিপরীত অবস্থা তৈরী না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ের সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া উচিত নয়।

(৮) সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যবসায়ের জড়িত হওয়ার ফলে বিভিন্ন মতাবলম্বী পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে যা সংঘাতে রূপ নিতে পারে।

সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সামাজিক দায়িত্বের সঠিক দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা। কারন অর্থনৈতিকভাবে দক্ষতাসহকারে কাংখিত মানের পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল সাধন কল্পে বিভিন্ন মাত্রায় সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। তবে মূল বিতর্ক হলো সামাজিক দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি নিয়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে- বিপক্ষে যুক্তিসমূহ বর্ণনা করে একটি চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের মতামত রয়েছে। বিশেষ করে অন্তঃবৃত্তিক ও মধ্যবৃত্তিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন বিতর্ক না থাকলেও বহিঃবৃত্তিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই বির্তকের অবতারনা করে থাকেন। ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকেই বির্তকের অবতারনা করে থাকেন। ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান, ওয়াল্টন ও থিউডোর লেভিট। রবার্ট এলব্যানিস অবশ্য সামজিক দায়িত্ব বিষয়টি অন্তঃবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তথা ব্যবস্থাপনার সমাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন পিটার এফ, ডাকার, ক্যানেগ ম্যাশন, ম্যালভিন এনসেন, আরভিং ক্রিষ্টাল ও মার্কিণ অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবস্থাপনা পরিবেশে বলতে কি বুঝেন?
২. অভ্যন্তরীণ- বাহ্যিক পরিবেশের সংজ্ঞা দিন।
৩. ব্যবস্থাপনা পরিবেশে সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৪. ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব বলতে কি বুঝায়?
৫. ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের মাত্রা বর্ণনা করুন।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানবর্ণনা করুন।।
৭. সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
৮. বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদান বর্ণনা করুন ।
৯. ব্যবস্থাপনা/ব্যবসায়ের উপর অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।
১০. ব্যবসায়ের উপর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করুন।
১১. ব্যবস্থাপনার উপর আইনগত পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।
১২. বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার উপর প্রযুক্তিগত পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।
১৩. ব্যবস্থাপনার উপর আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।
১৪. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়িত্বগুলো আলোচনা করুন।
১৫. ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্ব পালনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Ricky W. Griffin, Management,12th Edition, AITBS Publication, New Delhi.
- Introduction to Management, Dr.M A Mannan & Dr. Md. Ataur Rahman
- Fundamental of Management (10th Edition), Stephen P Robbins, Mary Coulter, David A DeCenzo, Harlow Publisher, England Pearson (2017).